

কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১০)

আমি সেই আধো-আলো আধো -অন্ধকারে প্রবেশ করলাম জমিদার বাড়ির সঁয়াত সঁয়াতে প্রায় খসে পড়া ইটের দেয়ালের ভগ্ন স্তূপে । প্রথমে ঢুকতেই হাতের বাঁদিকে সারি দেয়া অনেক গুলো কক্ষ । অধিকাংশেরই দরজা -জানালা খসে পড়ে গেছে কিংবা যাচ্ছে । প্রায় অর্ধবৃত্তাকার বারান্দার দুই দিকে দু'টো সিঁড়ি দো'তলায় উঠে গেছে । জমিদার পত্নীর পেছনে আমি দূর বতী সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি । হাতের বাম দিকে ধবসে পড়া খিড়কির ফাঁক ফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখছি ভগ্ন-প্রায় জীর্ণ কক্ষগুলোকে । বারান্দায় দাঁড়িয়ে তখনও সিমেন্টের আন্তর খসা কারু -কাজ করা পিলারগুলো । তার সাথেই নেমে গেছে অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ উঠোন অবধি । বারান্দা -সংলগ্ন দেয়াল ঘেষে উঠে গেছে বেয়াড়া গাছগুলো জমিদার বাড়ির সকল নিয়ম-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে । শ্যাঁওলা গুলোও কেমন পেঁতেছে রাজত্ব পুরো জমিদার বাড়ি জুড়ে ।

আমার সামনে তখন জমিদার পত্নী হেঁটে যাচ্ছেন । পায়ে পাতলা এক জোড়া চটি । ফিন ফিনে পাতলা ধব ধবে সাদা শাড়ির উপর কাশ্মিরী শাল জড়ানো । প্রায় হাঁটু পর্যন্ত বিনুনিহীন কালো চুল নেমে গেছে । এলাকার সবার প্রিয় কত্ৰী মা তখন আমার সদ্য পড়ে শেষ করা শরৎ চন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলক্ষী । এক ইন্দ্রনাথ ভাঙ্গা পাঁচিল ঘেরা কোন পোঁড়োবাড়িতে এক দিদির কাছে এসেছে লুকিয়ে । নিমিষেই বারো বছরের এক কিশোরের অন্তর থেকে যেনো মুহূর্তেই বিদেয় হয়ে গেছে একদা প্রতাপশালী জমিদারের সেই কঠিন -কঠোর জমিদারগিরির সমস্ত কল্প-কাহিনী । বরং মনের অজান্তেই পড়ন্ত সূর্যের ফিকে হয়ে আসা আলোর মতোই এক গোধূলির অন্ধকারে বিষন্ন হয়ে উঠেছে মনটা । প্রবল প্রতাপশালী জমিদার বাড়ির উপর করুণা আর সহানুভূতির এক দীর্ঘশ্বাস জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে আমার এতদিনের জাগ্রত ঘৃণাকেই কেমন হালকা করে দিয়েছে । এতদিন শুনে আসা জমিদারির রক্ত-চোষা শাসনকে কখন যেনো ভুলে গেছি । কালের আর ঘটনার আবর্তে জমিদার বাড়ির এই ভগ্ন-দশাতে নিজেই হয়ে গেছি বিমূঢ় । বাইরের চাকচিক্যের আড়ালে এই ক্ষয়ে যাওয়া আভিজাত্যের ঠুনকো বাতাবরণখানি উন্মোচিত হয়ে সমস্ত পরিবেশটা এক ক্ষুধিত পাষানের মতো ভেংগে পড়েছে আমার কিশোর হৃদয়ের কাছে ।

জমিদার গিন্নি প্রায় নিঃশব্দে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন এক তলার সিঁড়ি পেরিয়ে দো'তলার এক নির্জন কক্ষে । কিছুই প্রায় নেই কক্ষটিতে । আছে কতগুলো ভাংগা চেয়ার-টেবিল আর এক খানি দীর্ঘ হেলান -দেয়ার কেদারা । এমন ভাবে রয়েছে যেনো শরীর এলিয়ে দিলেই দেখা যাবে সামনের বাগান আর বাগানের পাশের সেই মাইল খানেক চওড়া দিঘি । আমি অপলপ দৃষ্টিতে সেই ধুলোময় আরাম কেদারাটি তাকিয়ে দেখছি । আর তাকিয়ে আছি পাশের সারি বাঁধা অনেকগুলো কাঠের আলমারির দিকে । সামনের কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য বইয়ের বাঁধানো মলাট । আলমারির উপরে বাঁধাই করা অনেকের ছবি । সেই সময়ে চেনা ছবিগুলোর মধ্যে এখনো মনে আছে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম আর নজরুলের ছবি । তার সাথে হয়তো আরও অনেকের

ছবি ছিল। আমার কিশোর বয়সের আয়ত্বের বাইরের সে ছবি গুলো হয়তো হবে জমিদারের কোন পূর্বপুরুষের কিংবা অন্য কোন মনিষীদের। কিন্তু আমার এখনো কী বিশ্বাস হয় একদা যে জমিদার বাড়ির ত্রিসীমানায় মুসলমান দূরে থাক - কোন বর্ণ - হিন্দুদেরও প্রবেশাধিকার ছিল না, তার পড়ার ঘরে নজরুলের ছবি? তখন কিশোর মনে সাম্প্রদায়িকতার নামে হিন্দু-মুসলমানের এই বিভাজন মনেই আসে নি।

ঘরের নীরবতা ভেংগে জমিদার পত্নী আমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, “তুমি তো কবিতা লেখো, তাই না?”

আমার তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার অবস্থা। ধরনী দ্বিধা হও - যেনো ঢুকে যাই পাতালে। লজ্জা আর বিস্ময়ে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে জানি না। আমাকে সহজ করে দিয়ে বললেন, “ওই তো সেদিন শুনলাম তোমার কবিতা রেডিও-তে পড়েছে।”

এতক্ষণে বুঝলাম কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। সত্তর দশকের শেষের দিকে শুরু হয়ে আশির দশকের মাঝ-অবধি বাংলাদেশ রেডিও-তে একটা অনুষ্ঠান ছিলো শিশু-কিশোরদের লেখা কবিতা আর ছড়া পাঠের। কোনো এক উৎসাহী বন্ধুর অতি-উৎসাহে সেখানে পাঠিয়েছিলাম একটা কবিতা। মনে নেই, হবে হয়তো মাত্রাবৃত্ত কিংবা স্বরবৃত্তে লেখা কোন কবিতা। বিষয় আমাদের গ্রাম, গ্রামের পাশের কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিখুঁত বর্ণনা। আর কিছু প্রতিভাবান শিক্ষকের জন্য আমরা অনেকেই অষ্টম শ্রেণীতেই ছন্দের উপর হাত পাঁকিয়েছিলাম সেই বয়সেই। তাই নিখুঁত ছন্দে লিখিত কবিতাটি হয়তো উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলো সেই রেডিও অনুষ্ঠানে। সেই কথাই এ কান সে কান করে জমিদার গিল্লির কানেও পৌঁছেছে। আর বিপত্তির উৎস সেটাই।

আমাকে কোন কথার সুযোগ না দিয়েই জমিদার পত্নী বলে যাচ্ছেন পাকিস্তানি হানাদারের হাতে নিহত জমিদারের সাহিত্য-প্রীতি আর সাহিত্যচর্চার কথা। আর অসংখ্য বইয়ের অমূল্য সব সংগ্রহের কথা। আস্তে আস্তে বেদনার এক কালো মেঘ মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। জমিদার পত্নীর কণ্ঠ ভারি হয়ে এলো প্রায় বছর দশেক আগে শেষ হওয়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের স্মৃতি - মন্ত্ৰনে। যার অধিকাংশ জুড়েই ভয়াবহ সব কাহিনী। কী নৃশংসভাবে শীতের এক সকালে জমিদারকে তার শয়ন কক্ষ থেকে নামিয়ে বাড়ির উঠোনেই সারা শরীর পেটল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে সে স্মৃতি। ছাদের এক নির্জন কুঠিরিতে অলৌকিক ভাবে দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে কিভাবে সেই জীবন্ত মানুষের পুড়ে মরা দেখেছেন সে স্মৃতি।

সহসা আমাকে চমকে দিয়ে জমিদার পত্নী যা বললেন - শুনে সেই কিশোর বয়সেই শিউরে উঠলাম আমি।

“জানো কে পাকিস্তানী বাহিনীকে জমিদার বাড়িতে এনেছে? কে এই কুঁড়ি - পাঁচিশ জন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে সাহায্য করেছে?” - কিছুক্ষণ পরে থেমে গেলেন তিনি। হয়তো নিজেকে সামলে নিলেন এই ভেবে যে - কি হবে এই কিশোর মনে ঘাতকের প্রতিলিপি লিখে দিয়ে? কি হবে এই কোমল হৃদয়ে হত্যা নামক এক বিভৎস চিত্রের কালো রং ছড়িয়ে?

সেদিন থেমেছিলেন সব-হারানো সেই শোকাতুরা রমনী । কিন্তু পরে জেনেছি, মানিকগঞ্জের তেরশ্রীর সেই গন হত্যার নায়কেরা পরবর্তীতে একদা মুক্তিযোদ্ধা এক সামরিক জেনারেল আর তার হাতে প্রতিষ্ঠিত দলেরই অনেক বড় নেতা হয়েছিলেন । সেদিনের সেই বিধবা যে নামগুলো উচ্চারণ করতে পারেন নি ঘুনায় কিংবা ভয়ে , স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা কী পরেছি তাদের বিচার দূরে থাক - নামগুলো লিখে যেতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে? অথচ সেদিন আমার কিশোর মনে তেমন কোন কৌতুহল জাগে নি সেই স্বাধীনতা বিরোধীদের নাম জানতে । কারণ, তখন স্বাধীনতা মানেই তো ছিলো কবি শামসুর রাহমানের সেই “স্বাধীনতা” কবিতা । তখন কী জানতেম স্বাধীনতা মানেই রাজাকার নামক স্বাধীনতাবিরোধী পিশাচদের সাথে বসবাস সারাটি জীবন ? তখন কী জানতেম স্বাধীনতা মানেই তিমির থেকে অন্ধকারে যাত্রা? তখন কী জানতেম স্বাধীনতা মানে স্বাধীন দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচা এই বিভূঁই বিদেশে ?

সেই শুভ্র-বসনা রাজলক্ষী স্মৃতির কড়া নেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন এ ঘর থেকে ও ঘরে । আর আমি বাধ্য ছেলের মতো তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছি - স্বাধীন - সুবোধ এক কিশোর ।

(চলবে)

।। ডিসেম্বর ২৫ , ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ।।

sarkerbk@yahoo.com